مختصر منهاج القاصدين এর অনুবাদ

সংক্ষিপ্ত

ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

প্রথম খণ্ড

ইমাম গাযালী رحمه الله

তাহকীক ও সংক্ষেপণ
ইমাম ইবনুল জাওযী رحمه الله এবং
ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী رحمه الله

মাহদি হাসান
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

আমাদের কথা ১৬

সম্পাদনা-জ্ঞাতব্য ১৮

ইমাম গাযালী ﵀ ও তাঁর ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২০

বই প্রসঙ্গে ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী ২৮

ভূমিকা ৩৩

ইমাম ইবনুল জাওযীর ভূমিকা ৩৫

প্রথম ভাগ : ইবাদাত

অধ্যায় : ইলম (৩৯-৬১)

- **ইলম অর্জনের ফযীলত, গুরুত্ব ও ইলম সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনা ...৩৯**
  - ইলম অর্জনের ফযীলত ৩৯
  - ইলম শেখানোর ফযীলত.....৪১
  - কোন ইলম অর্জন করা ফরয?.....৪৩
  - বান্দার কর্তব্য অনুযায়ী ইলম অর্জন করা আবশ্যক ৪৪
  - সবার উপর অর্জন করা ফরয ইলম কী?.....৪৫
  - অনাবশ্যক ইলম ও অবৈধ ইলম ৪৬
- **ইলমুল মুআমালা ৪৭**
  - ইলমুল মুআমালার গুরুত্ব.....৪৭
  - কিছু শব্দের অপব্যাখ্যা..... ৪৮

- **উলূমে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় ইলম ৫১**
  - উলূমে মাহমূদাহর প্রকার ৫১
- **বাহাস-বিতর্ক ও মন্দ চরিত্র ৫২**
- **শিক্ষার্থীর কর্তব্য ৫৩**
  - ইলমকে প্রাধান্য দেয়া ৫৩
  - শিক্ষকের কাছে বিলীন হয়ে যাওয়া ৫৩
  - মতভেদপূর্ণ বিষয়ে করণীয় ৫৪
- **শিক্ষকের কর্তব্য ৫৫**
- **ইলমের বিপদ, উলামায়ে সূ এবং উলামায়ে আখিরাতের বর্ণনা ৫৭**
  - উলামায়ে সূ ৫৭
  - উলামায়ে আখিরাত বা পরকালমুখী আলিমের বৈশিষ্ট্য ৫৮

অধ্যায় : পবিত্রতা (৬২-৬৪)

- **পবিত্রতার সংজ্ঞা, রহস্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা ৬২**
  - পবিত্রতার স্তর ৬২
  - পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে ভুল ধারণা ৬৩
  - ময়লা-আবর্জনা দুই প্রকার ৬৩

অধ্যায় : সালাত (৬৫-৭৭)

- **শরীয়তে সালাতের গুরুত্ব, সালাতের প্রাণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৬৫**
  - সালাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা ৬৫
  - সালাতের প্রাণশক্তি ও পরিপূর্ণতা ৬৭
  - সালাত আদায়কারীর কর্তব্য ৬৯
- **জুমুআর নামায এবং জুমুআর দিন সম্পর্কিত আদবসমূহ ৭১**
  - জুমুআর দিনের পালনীয় ১৫টি আদব ৭১
- **নফল সালাতের বর্ণনা ৭৫**
- **নামাযের নিষিদ্ধ সময়ের রহস্য ৭৬**

অধ্যায় : যাকাত (৭৮-৮৭)

- **যাকাতের রহস্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা ৭৮**
- **ইবাদাতের প্রকারভেদ ৭৮**
- **যাকাতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম আদবের বর্ণনা ৭৯**
- **যাকাত গ্রহণকারীর পালনীয় আদবসমূহ ৮৩**
  - স্বচ্ছল ব্যক্তির যাকাতগ্রহণ ৮৪
- **নফল সাদাকার বিবরণ, ফযীলত ও আদব ৮৫**
  - সাদাকার ফযীলত ৮৫
  - সাদাকার আদব ৮৬
  - সবচেয়ে উত্তম সাদাকাহ ৮৭

অধ্যায় : রোযা (৮৮-৯৩)

- **রোযার ফযীলত, গুরুত্ব, রহস্য ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা ৮৮**
  - রোযার ফযীলত ৮৮
  - রোযার সুন্নাত ৮৯
  - রামাদানের শেষ ১০দিন ৮৯
  - রোযার রহস্য ও আদবের বর্ণনা ৯০
  - বিশেষ রোযার আদবসমূহ ৯০
  - নফল রোযা কখন রাখবেন ৯১

অধ্যায় : হজ (৯৪-৯৯)

- **হজের তাৎপর্য, ফযীলত ও আদব ৯৪**
  - হজপ্রত্যাশীর কর্তব্য ৯৪
  - সফরে করণীয় ৯৫
  - হজের সফরে বের হওয়ার আগে করণীয় ৯৫
- **হজের অন্তর্নিহিত কিছু আদব ও রহস্য ৯৬**
  - হজের শিক্ষা ৯৬

অধ্যায় : তিলাওয়াত (১০০-১০৭)

- **কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত ও আদবের আলোচনা ১০০**
  - কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত ১০০
- **তিলাওয়াতের আদব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১০২**
  - কোন অবস্থায় তিলাওয়াত করবে ১০২
  - কতটুকু পরিমাণ তিলাওয়াত করবে ১০৩
  - তিলাওয়াতের পরিমাণে ভারসাম্য রক্ষা করা ১০৩
  - ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ১০৩
  - তিলাওয়াতের সৌন্দর্য ও সুর ১০৪
  - নামাযে তিলাওয়াতের হুকুম ১০৪
  - কুরআন তিলাওয়াতকারী যা লক্ষ করবে— ১০৪
  - আয়াতের মর্ম উপলব্ধি ১০৫
- **কুরআন বোঝার প্রতিবন্ধকতা ১০৬**
  - আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ করা চাই ১০৬

অধ্যায় : দুআ-যিকির-আওরাদ (১০৮-১৩৫)

- **দুআ ও যিকিরের ফযীলত, আদব এবং রাত-দিনের আমল ১০৮**
  - যিকিরের মহিমা ১০৮
- **দুআর মহিমা ১০৯**
- **দুআর আদবসমূহ ১১০**
  - দুআ করার আগের আদব ১১০
  - দুআর মধ্যবর্তী আদব ১১০
- **আওরাদ তথা রাত-দিনের আমল সময় অনুযায়ী বণ্টন করে নেওয়া .. ১১০**
- **দিন-রাতের নির্ধারিত আমলের বর্ণনা এবং তার বিন্যাস ১১১**
  - দিনের আমল ১১১
  - রাতের আমল ১১৯
  - ঘুমের আদব ১২১

- **আবিদের অবস্থাভেদে দৈনন্দিন আমলের ভিন্নতা..... ১২৬**
  - আবিদদের (ইবাদাতপ্রাণ ব্যক্তি) শ্রেণি-বিভক্তি ১২৬
  - শ্রেণিভেদে আবিদগণের আমল ১২৬
- **তাহাজ্জুদের ফযীলত ও সহজ উপায় এবং অন্যান্য আলোচনা ১২৯**
  - তাহাজ্জুদের ফযীলত ১২৯
  - রাত জেগে নামায আদায়ের সহজ উপায় ১৩০
  - রাত জাগার কয়েকটি স্তর ১৩১
  - রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে করণীয়.....১৩৩
- **ফযীলতপূর্ণ দিন, ফযীলতপূর্ণ রাত ১৩৩**
  - বছরের ফযীলতপূর্ণ রাত.....১৩৩
  - বছরের ফযীলতপূর্ণ দিন ১৩৪
  - সপ্তাহের বিশেষ দিন.....১৩৪

দ্বিতীয় ভাগ : দৈনন্দিন জীবনের বিধি-নিষেধ ও শিষ্টাচার

অধ্যায় : খাবারগ্রহণ ও মেহমানদারী (১৩৭-১৪৩)

- **খাবারগ্রহণ, খাবারের জন্য সমবেত হওয়া এবং মেহমানদারীর আদব.... ১৩৭**
  - খাবার গ্রহণের আদব ১৩৭
  - মেহমানদারী বা আতিথেয়তার আদবসমূহ ১৪১
  - দাওয়াত গ্রহণ করার বিধান ও আদবসমূহ..... ১৪১
  - খাবার পরিবেশনের আদব..... ১৪২
  - মেজবানের জন্য আরো কিছু কর্তব্য..... ১৪৩
  - মেহমানের জন্য করণীয় ১৪৩

অধ্যায় : বিবাহ-দাম্পত্য (১৪৪-১৫৩)

- **বিবাহের উদ্দেশ্য, বিধান, আদব ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ..... ১৪৪**
  - বিবাহের উপকারিতা ১৪৪
  - বিবাহের কিছু ঝুঁকির দিক..... ১৪৫
  - সুখী দাম্পত্যের সূত্র..... ১৪৬
  - স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ এবং তাদের করণীয় ১৪৭

অধ্যায় : জীবিকা-উপার্জন (১৫৪-১৬২)

- **জীবিকা নির্বাহের আদব ও ফযীলত, সঠিক উপায়ে লেনদেন..... ১৫৪**
  - হালাল উপার্জনের ফযীলত এবং উপার্জনে উৎসাহ প্রদান ১৫৪
  - লুকমান হাকিমের উপদেশ ১৫৫
  - আল্লাহর প্রতি ভরসা ও জীবিকা উপার্জন ১৫৬
  - ইবাদাত ও ব্যবসার সম্পর্ক ১৫৬
- **উপার্জনের চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা ১৫৭**
  - প্রথম বিষয় : চুক্তির সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ..... ১৫৭
  - দ্বিতীয় বিষয় : ইনসাফ ১৫৯
  - তৃতীয় বিষয় : ইহসান ১৬০
  - চতুর্থ বিষয় : দীন ও আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা..... ১৬০

অধ্যায় : হালাল-হারাম (১৬৩-১৭৮)

- **হালাল-হারামের বর্ণনা, স্তরবিন্যাস ও অন্যান্য আলোচনা ১৬৩**
  - হালাল-হারামের বর্ণনা..... ১৬৩
- **এক : হালালের ফযীলত, হারামের নিন্দা এবং স্তরবিন্যাসের বিবরণ . ১৬৪**
  - হালালের ফযীলত, হারামের নিন্দা..... ১৬৪
  - হালাল-হারামের বিভিন্ন স্তর..... ১৬৫
  - তাকওয়ার চার স্তর..... ১৬৫
- **দুই : সন্দেহজনক বস্তুর স্তরবিন্যাস ও হালাল-হারাম থেকে পৃথকীকরণ... ১৬৬**

- সন্দেহের সংজ্ঞা ১৬৭

তিন: (হালাল-হারাম সম্পর্কে) যাচাই ও জিজ্ঞাসা করার হুকুম ১৭০

চার : সম্পদ সংক্রান্ত অন্যায় থেকে তাওবাকারীর নিষ্কৃতি ১৭২

পাঁচ : সুন্নতানদের উপহার এবং অত্যাচারী সুন্নতানের সাথে করণীয়.... ১৭৩

- অত্যাচারী শাসকদের সাথে সম্পর্ক..... ১৭৩
- শাসকের সংস্পর্শে গুনাহের আশঙ্কা : ১৭৪

অধ্যায় : সঙ্গ-সংস্রব ও নিভৃতি (১৭৯-২১৩)

সান্নিধ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৃষ্টিজীবের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত আদবসমূহ..... ১৭৯

- উত্তম চরিত্রের পুরস্কার..... ১৭৯
- আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের বিধান..... ১৮০
- সঙ্গ-সংমিশ্রণের শর্তাবলি..... ১৮২
- দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের হক..... ১৮৫

উপসংহার : মানুষের মাপিত দৈনন্দিনের আদবসমূহ ১৯১

- সাধারণ মুসলিম, আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং মালিকের অধিকার ১৯২
- সুস্থ ব্যক্তির উপর অসুস্থ ব্যক্তির হক ও তার আমল ১৯৫
- জীবিতদের উপর মৃত ব্যক্তির হক..... ১৯৬
- প্রতিবেশীর অধিকার ও ভিন্নতা ১৯৭
- আত্মীয়তার অধিকার ১৯৮
- সন্তানের অধিকার ১৯৮
- দাস ও পরিচারকদের অধিকার ১৯৯

নিভৃত থাকার পক্ষ-বিপক্ষ ১৯৯

- কোনটি উত্তম? ১৯৯
- নিভৃত-জনবিচ্ছিন্ন থাকার কিছু উপকারিতা, কিছু ক্ষতি ও সর্বোপরি তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ২০২
- নির্জনে থাকার মন্দ দিক ২০৭
- নির্জন থাকার আদব..... ২১২

অধ্যায় : সফরের আদব (২১৪-২১৮)

- **সফরের প্রকার, উদ্দেশ্য, আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ অন্যান্য আলোচনা . ২১৪**
  - সফরের প্রকার ২১৪
  - মুসাফিরের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়াদি ২১৭

অধ্যায় : সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ (২১৯-২৩২)

- **সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের হুকুম, স্তর, শর্ত এবং এ-ব্যাপারে শরীয়তের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ২১৯**
  - ন্যায় ও অন্যায়ের আদেশ-নিষেধের হুকুম.....২১৯
  - অসৎ কাজে নিষেধের স্তর এবং এ সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনা..... ২২০
  - সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার চারটি রুকন .. ২২১

অধ্যায় : প্রচলিত ভুল এবং শাসকবর্গকে ন্যায় ও অন্যায়ের আদেশ-নিষেধ প্রসঙ্গ (২৩৩-২৫৫)

- **প্রথম ভাগ : প্রচলিত ভুল ও গুনাহের কাজসমূহ..... ২৩৩**
  - মসজিদে করা হয়—এমন কিছু মন্দ কাজ.....২৩৩
  - বাজারে করা মন্দ কাজসমূহ ২৩৪
  - রাস্তা সংক্রান্ত মন্দ কাজসমূহ.....২৩৪
  - গোসলখানা ও বাথরুম সংক্রান্ত মন্দ কাজসমূহ.....২৩৫
  - মেহমানদারী সংক্রান্ত ভুলসমূহ.....২৩৬
  - সাধারণ মন্দ কাজসমূহ.....২৩৭
- **দ্বিতীয় ভাগ : শাসকবর্গকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধাজ্ঞা..... ২৩৭**
  - শাসকশ্রেণিকে সালাফদের উপদেশ দেওয়ার কয়েকটি ঘটনা ২৩৮

সংগীতের বিধান (২৫৬-২৫৮)

নবীজির চরিত্র ﷺ (২৫৯-২৬৪)

- **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা..... ২৬৩**

তৃতীয় ভাগ : আত্মার পরিচর্যা

অন্তরের রহস্যসমূহ (২৬৬-২৭২)

- দ্বীনের পথের সূচনা ২৬৬
- অন্তর ইবলীসের প্রবেশদ্বার ২৬৬
- শয়তানের জন্য অন্তরের প্রধান দরজাগুলো ২৬৭
- শয়তানকে পরাজিত করতে বান্দার করণীয় ২৬৯
- শয়তানের দৃষ্টান্ত..... ২৬৯
- অন্তরের মন্দ চিন্তার বিধান ২৭০
- কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকার দুআ..... ২৭১
- অন্তরের শ্রেণি..... ২৭১

অধ্যায় : আত্মশুদ্ধির রূপরেখা (২৭৩-২৯২)

অন্তরের পরিচর্যা, চরিত্রের পরিমার্জন ও অন্তরের চিকিৎসা ২৭৩

- এক : সচ্চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অসচ্চরিত্রের নিন্দনীয়তা বিষয়ক..... ২৭৩
- দুই : অন্তর পরিচর্যার পদ্ধতি ২৭৭
- তিন : অন্তরের ব্যাধির উপসর্গ, চিকিৎসা এবং নিজের দোষ-ত্রুটি চেনার পদ্ধতি..... ২৭৮
- উপসংহার : প্রবৃত্তির রহস্য ও বান্দার করণীয়..... ২৮২
- উত্তম চরিত্রের নিদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা ২৮৩

বেড়ে ওঠার বয়সে শিশুর পরিচর্যা ২৮৮

অধ্যায় : মানবজীবনের দুই মহাপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ (২৯৩-২৯৬)

আহার-প্রবৃত্তি ও যৌন-প্রবৃত্তি ২৯৩

- আহার-প্রবৃত্তির স্বরূপ ২৯৩
- আহার-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের উপায়..... ২৯৪

- যৌন-প্রবৃত্তির রহস্য ২৯৫
- যৌন-প্রবৃত্তি সংযত রাখতে করণীয় ২৯৫

অধ্যায় : যবানের আপদসমূহ (২৯৭-৩১৬)

- চুপ থাকার উপকার ২৯৭
- চুপ না-থাকার আপদসমূহ ২৯৮
- গীবতের অর্থ ৩০৪
- গীবত শোনার বিধান ৩০৫
- গীবতের প্রতিকার ৩০৭
- যে-সব কারণে কারো দোষ বর্ণনার অনুমতি রয়েছে ৩০৯
- গীবতের কাফফারা ৩১০
- আল্লাহর 'সিফাত' নিয়ে সাধারণদের প্রশ্ন ৩১৬

অধ্যায় : ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ (৩১৭-৩৩৬)

সংজ্ঞা, উৎস, ক্ষতি ও প্রতিকার ৩১৭

- ক্রোধের সংজ্ঞা ও উৎস ৩১৭
- মানুষের রাগ তিন পর্যায়ের—বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি এবং মধ্যবর্তী ... ৩১৯
- রাগের উৎস ও তার প্রতিকার-পদ্ধতি ৩২০
- রাগ নিয়ন্ত্রণের ফযীলত ৩২৩

সহনশীলতার মহৎ গুণ ৩২৪

ক্ষমা ও দয়া : দুই অনন্য গুণ ৩২৬

হিংসা ও বিদ্বেষ : প্রকৃতি ও প্রতিকার ৩২৭

- হিংসার প্রতিকার ৩২৯
- হিংসার কারণ ৩৩০
- অহংকারবশত হিংসা ৩৩১
- ক্ষমতার লোভবশত হিংসা ৩৩২
- নিকৃষ্ট অন্তরের হিংসা ৩৩২
- 'হুব্বুদ দুনিয়া' বা জাগতিকতার মোহ মন্দ স্বভাবের উৎস ৩৩৩

- জ্ঞান ও সম্পদের পার্থক্য ৩৩৪
- হিংসার চিকিৎসা-পদ্ধতি..... ৩৩৫
- হিংসারোগের আমলী চিকিৎসা ৩৩৬

অধ্যায় : দুনিয়ার প্রকৃত রূপ (৩৩৭-৩৪৫)

- কুরআনের ভাষায় ৩৩৭
- হাদীসের বাণীতে ৩৩৮
- সালাফের চোখে..... ৩৩৯
- দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৩৪১
- দুনিয়ার নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় বস্তু ৩৪৪

অধ্যায় : সম্পদের প্রশংসা ও নিন্দনীয়তা (৩৪৬-৩৬৪)

- সম্পদের প্রশংসনীয়তা..... ৩৪৭
- সম্পদের উপকারিতা..... ৩৪৭
- সম্পদের ক্ষতি ও বিপদসমূহ..... ৩৪৯

অল্পেতুষ্টি, অপ্রত্যাশা ও লোভ-লালসার আলোচনা ৩৫১

- অল্পেতুষ্টি ও অপ্রত্যাশার প্রশংসনীয়তা ৩৫১
- লোভ ও লালসার নিন্দনীয়তা ৩৫১
- লোভের চিকিৎসা ও অল্পেতুষ্টি অর্জনের তরীকা ৩৫২
- উপসংহার : সারকথা..... ৩৫৪

দানশীলতার ঘটনা ৩৫৫

কৃপণতার নিন্দা প্রসঙ্গ..... ৩৫৮

কৃপণতার ঘটনা ৩৫৯

- অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মাহাত্ম্য ও কয়েকটি ঘটনা..... ৩৬০
- দানশীলতা ও কৃপণতার সংজ্ঞা..... ৩৬২
- কৃপণতার উৎস ও চিকিৎসা ৩৬৩

ইমাম গাযালী ও তাঁর ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রাহিমাহুল্লাহকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই। কিন্তু যতটা 'নেই' আমরা অকপটে বলি, ততটা ঘনিষ্ঠ পরিচিত তিনি আমাদের কাছে এখনো হয়ে ওঠেননি-এটিই সত্য! যেই ইমাম গাযালী ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতকে গ্রিক দর্শনের খাদে পড়া ইসলামী জ্ঞানচর্চার উদ্ধারকারী, মুসলিম সামাজিক ও রাজনৈতিক চরম অধঃপতনের লাগামধারী সেই ইমাম গাযালীকে আমরা কতটুকু চিনি; অধিকন্তু যখন কালক্রমে আমাদেরই সামাজিক অধঃপতন ও আত্মপরিচয় আবিস্কারের প্রশ্নে তা অধিক প্রাসঙ্গিক ও মুখ্য হয়ে এ-প্রশ্নকে আরো জটিল করে তুলেছে? সত্য যে, তা বিস্তৃত দুইটি কালক্রমকে শিক্ষা, সভ্যতা, রাজনীতি ও প্রভাবক শক্তিসহ সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নির্ণয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আবার একইসাথে ইমাম গাযালীকে গভীরভাবে পাঠ ও আবিস্কারেরও ব্যাপার। কিন্তু সেই যথার্থ সত্যটুকু আমাদের বিদ্যমান জ্ঞানচর্চার ধারায় কি কোনো বিরাট প্রভাব ফেলেছে? মুসলিম সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নে ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ কি চর্চিত হচ্ছে? এই প্রশ্নটিকে মাথায় রেখেই ইমাম গাযালীর জীবন ও তাঁর *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাতের চেষ্টা।

মোটাদাগে ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহর জীবন দুটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে জীবনের সেই অংশ, যা তিনি 'সাআদাত ও ইয়াকীন' তালাশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার আগে 'যাপন' করেছিলেন। আর দ্বিতীয় ভাগে তার পরবর্তী অংশ।

এই দুই ভাগ ছাড়াও যে তার বহুধা বিভক্ত অথচ প্রতিটি বিভক্তিতেই তার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল এক জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা যায়, তা বলা বাহুল্য। যাই হোক, তাঁর জীবন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব সামাজিক ও জ্ঞানকেন্দ্রিক কী কী সংকটের সম্মুখীন ছিল তা দেখা যাক—

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, 'হিজরী পঞ্চম শতকে দর্শন শাস্ত্র ও বাতিনিয়া মতাদর্শের বিপুল প্রভাব মুসলমানদের চিন্তা-চেতনাকে টলায়মান করে ফেলেছিল। যার অনিবার্য পরিণতি ছিল, মুসলিম আকীদায়

অনস্তিত্ববাদের জন্ম, চরিত্র-শিষ্টাচারের অধঃপতন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ঘোর কালোকাল অতিক্রমণ। তাই এ-সময় মুসলিম বিশ্ব এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্য হাহাকার করছিল, যিনি—তাদের আকীদায় হৃত ঈমানী জৌলুস ফিরিয়ে আনবেন, ধর্মীয় প্রশ্নে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে দর্শনের যুক্তি-তর্কের উত্তম বিকল্প প্রমাণ করবেন, দর্শনের দ্বারস্থ না হয়েই ধর্মের মৌলিক উৎস থেকেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ও উত্তরণের সহজলব্ধ ধর্মীয় জ্ঞানচর্চাকে সমাজে তুলে ধরবেন; পাশাপাশি তাদের চারিত্রিক অধঃপতন রোধে সমাজের বিদ্যমান রীতি-নীতিকে সংস্কার করে নতুন পথ বাতলে দেবেন।

মূলত, এ-সময়ের জন্য দরকার ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বের, যিনি গ্রিক-ইউনানী দর্শন ও বাতিনী মতাদর্শকে ভুল প্রমাণ করে শাশ্বত ইসলামকে যুক্তির আলোকে তার রূহানিয়্যাতসমেত নতুন রূপে পেশ করবেন। কিন্তু, এ-জন্য তাঁকে হতে হবে শরীয়তের জ্ঞান ও দর্শনের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক অবগত এমন এক সত্যান্বেষী, যিনি নিজের ঈমানী শক্তির পাশাপাশি বলিয়ান হবেন মেধা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও নিয়ত উদ্ভাবনী শক্তিবলেও। কেননা, তাঁকে যুগের ভাষা রপ্ত করে তারই মতো করে নিজের বয়ান বাজারে চালান করতে হবে এবং মন্দা করে ফেলতে হবে বাজারের চলমান পণ্য—ইউনানী দর্শন ও বাতিনী মতবাদ-এর প্রচলন।'

অতঃপর নদভী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, 'মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যের প্রসন্নতা যে, পঞ্চম হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে—যখন তারা সর্বোচ্চ সংকটাপন্ন ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল এমন এক ব্যক্তির প্রতি—তারা তাঁর দেখা পেয়েছিল। আর ইসলামের ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিটি হলেন ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ।'[১]

দ্বিতীয়ত, সে-সময়ে সেলজুক সাম্রাজ্যের সাথে আব্বাসী খিলাফাতের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবেও মুসলমানরা একটি ঝুঁকিপূর্ণ সময় অতিক্রম করছিল। মুসলমানদের বৃহৎ এ-দুই সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘোচাতে তাদের মধ্যস্থতা করার জন্যেও দরকার ছিল একজন প্রজ্ঞাবান ও অতিকুশলী আলিমের। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন, ইমাম গাযালীই মুসলমানদের সেই দরকার পূরণে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তূসী আল-গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র জন্ম ৪৫০ হিজরী মুতাবিক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের খোরাসানের অন্তর্বর্তী তূস শহরের তাবারান এলাকায়। জন্মের কয়েক বছর পর মাথার উপর থেকে পৈতৃক

[১] *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ* : ১/২২০।

ছায়া হারিয়ে এক দুঃখবৎসল জীবন বরণ করতে হয় তাঁকে ও ভাই আহমাদকে। তাঁদের পিতা ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র একজন পশমী সুতা ব্যবসায়ী। দিনের সিংহভাগ সময়ই তিনি কাটাতেন বিভিন্ন ইলমী মজলিসে কিংবা কোনো সূফী তাপসের সান্নিধ্যে। হয়তো সেই সুবাদেই এক সময় তিনি করুণভাবে অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে একটি ছেলেসন্তান কামনা করেন, যে হবে যুগের বড় ফকীহ ও আলিম। আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনা কবুল করেছেন।

কৈশোরে পিতার অবিভাবকত্ব হারালেও জীবনের খেই হারানোর আগেই পিতার ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই এক সূফী ও দরিদ্র বন্ধু। দরিদ্র হওয়ায় খুব বেশিদিন তিনি তাঁদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। আর কোনো উপায় না পেয়ে তিনি তাঁদের একটি মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। নিজ দেশে প্রাথমিক পড়াশোনাশেষে ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ জুরজানে গিয়ে ইমাম আবু নাসর ইসমাঈলীর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং জুরজান থেকে পুনরায় তূসে চলে আসেন। জুরজান থেকে পুনরায় তূসে ফেরার পথেই তাঁর জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে, যা তাঁকে ইমাম গাযালীতে পরিণত করে। ঘটনা হলো, জুরজানে পড়াশোনাকালে যে-সকল পাঠ্য তিনি খাতায় লিখে এনেছিলেন, পথে ডাকাত পড়ায় তা তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন অনুনয়-বিনয় করে তিনি ঐ খাতা-কটি ডাকাতের কাছে ফেরত চান। ডাকাত তাঁকে উপহাস করে বলে, **'এ-কেমন জ্ঞানী তুমি, তোমার জ্ঞান আটকা পড়ে গেছে কাগজের খাতায়?'**

উপহাসমূলক এই প্রশ্ন শুনে ইমাম গাযালী হকচকিয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, এমন জ্ঞানের কী মূল্য, সম্পদের মতো যা ডাকাতও ছিনিয়ে নিতে পারে? এ-ঘটনায় তিনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জ্ঞানের মূলমন্ত্র রপ্ত করে নিয়েছিলেন ঐ ডাকাতের কাছ থেকে। পরবর্তী-জীবনে তা কাজে লাগিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন যুগের অনন্য ও পৃথিবী-বিখ্যাত বিদ্বান। তিনি বলেন, 'আমার পাঠ্যলিপি ডাকাতি হওয়ার ঐ ঘটনার পর তূসে ফিরে টানা তিন বছরে আমি আমার সমস্ত পাঠ্যলিপি মুখস্থ করে ফেলি।'

ইমাম গাযালীর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী রাহিমাহুল্লাহ। যিনি স্বীয় যুগের একাধারে হাদীস, ফিকহ, উসূল, মাযহাব ও ইলমুল কালামেরও বড় পণ্ডিত ছিলেন। সে-কালে বাগদাদের পর নিশাপুর ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জ্ঞানের শহর। জ্ঞানান্বেষণের জন্য নিশাপুরে গিয়েই ইমাম গাযালী স্বীয় উস্তায ইমামুল হারামাইনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ইমামুল হারামাইন

বলেন, 'গাযালী এক গভীর মহাসাগর। প্রায় চার শ' সহপাঠীকে ছাড়িয়ে সে দিনেদিনে অনন্য হয়ে উঠেছিল। এক সময় সে-ই তাদেরকে দারসের পুনরাবৃত্তি করে শোনাত এবং তাদের কাছে উস্তাযের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাসিত হলো।'

৪৭৮ হিজরী মুতাবিক ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর ইমাম গাযালী সেলজুক-ওযীর নিযামুল মুলকের অধীনে চাকরির পদ লাভ করেন। এ-সময় তাঁর বয়স ২৮ বছরও অতিক্রম করেনি। তবু অল্প কদিনেই তিনি নিযামুল মুলকের কাছে আগত বাগদাদের সকল আলিমের চোখে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ ও কালামবিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মেধা ও জ্ঞানের প্রখরতা এবং চতুর্মুখিতা দেখে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে নিযামুল মুলক তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান মাদরাসা, বাগদাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ, মাদরাসায়ে নিযামিয়ার শিক্ষক পদে নিয়োগ দেন। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী লেখেন, 'নিজের জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতিসুলভ তৎকালে আলিমদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল মাদরাসায়ে নিযামিয়ার শিক্ষকপদ লাভ করা। অথচ নিতান্ত কম বয়সেই ইমাম গাযালী তা অধিকার করেছিলেন।'[১]

এ-দিকে সমগ্র বাগদাদে ইমাম গাযালীর অভূতপূর্ব এই অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাজসভায় যুক্তি-তর্কে কিংবা নিযামিয়ার দরসগাহে পড়ানোর সময় তাঁর উপস্থাপনার দৃঢ় ভঙ্গি, দূরদর্শী বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম জটিলতা সমাধানের মেধা-জ্ঞান তাঁকে সবার কাছে অল্প-কদিনেই সুপরিচিত ও সর্বোচ্চ সমীহের পাত্র করে তোলে। তাঁর সমসাময়িক আলিম আবদুল গাফির আল-ফারিসী বলেন, 'বাগদাদে ইমাম গাযালীর সম্মান-মর্যাদা তখন রাজ্যের অন্যান্য আলিম-উলামা ও আমির-উমারাদের চেয়েও তুঙ্গে ছিল।'[২]

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র এই জীবন নিঃসন্দেহে এক কাঙ্ক্ষিত ও মাহাত্ম্যের জীবন ছিল। চতুর্দিক থেকে তাঁর অনন্য স্বীকৃতি আসছিল। সেই সাথে আসছিল রাশিরাশি সম্মানসূচক অভিধা, উপাধী ও স্তুতির বাণ। আবার রাজদরবারে বিশেষ সম্মানের পাত্র হয়ে ছিলেন বলে বাহ্যিক কোনো কিছুর অভাবই জীবনে ছিল না। এমতাবস্থায় স্বভাবতই ইমাম গাযালীর আত্মতৃপ্ত ও স্থির জীবনযাপনের কথা ছিল। কিন্তু ইমাম গাযালী তখন ভেতর থেকে অনুভব করেন কীসের যেন শূন্যতা। সব আছে, যেন প্রাণটুকু নেই—এমত এক হাহাকার দিনাদিন তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন

[১] *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ* : ১/২২৫।
[২] *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা* : ৪/১০৭।

করে ফেলে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেন, পার্থিব জ্ঞান-ঐশ্বর্যের চূড়ায় বসে আছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে স্বস্তি মিলছে না। মনেমনে হিসেব কষেন, তাঁর এই পর্যাপ্ত পুথিজ্ঞানই শুধু এই অধঃপতিত সমাজের ত্রাতারূপে নিজেকে নিবেদন করতে যথেষ্ট নয়। এসব ভেবে তিনি এক অজ্ঞাত জ্ঞানের সন্ধানে অস্থির হয়ে ওঠেন। ফলে এ-যাবৎ ইমাম গাযালীর জীবনে যে-আড়ম্বরতা ছিল, হঠাৎ-ই তাতে স্তিমিতি আসে। আর দেখা দেয় অস্থিরতা। সে-অস্থিরতা এ-জীবন থেকে পালিয়ে অন্য এক জীবনের সন্ধানমূলক অস্থিরতা। সে-অস্থিরতা সত্য দর্শনের অস্থিরতা। জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের অস্থিরতা। ইমাম গাযালী বলেন, 'আমি ইচ্ছা করেই এই বন্ধুর পথ মাড়াইনি। প্রকৃত জ্ঞান ও তার গন্তব্য দর্শনের এই তৃষা আমার মধ্যে আশৈশব বিরাজ করছিল।'[১]

কিন্তু এই তুমুল তৃষা ইমাম গাযালীকে কোন পথে নিয়ে গিয়েছিল? অবশেষে কী দিয়েছিল? এই প্রশ্নটি থেকেই ইতিহাস ইমাম গাযালীকে নতুনরূপে আবিস্কার করে। যিনি শত শত বছর পরেও সমান প্রাসঙ্গিক ও মুসলমানদের শিক্ষা, সামাজিকতা, ধর্মীয়-নৈতিক সকল সংকট থেকে উদ্ধারের প্রশ্নে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হতে থাকেন।

মূলত এই পর্ব থেকেই ইমাম গাযালী ততধিক অমরত্ব লাভ করেছেন; ইতিহাসে। জীবনের এ-পর্বেই তিনি যাপিত জীবনের কোলাহল থেকে দূরে সরে এসে মুসলিম উম্মাহকে নিজের তালাশকৃত 'সাআদাত ও ইয়াকীন' তথা 'অমৃত সৌভাগ্য ও চরম বিশ্বাসে'র সন্ধান দিয়ে রচনা করেছেন তাঁর ঐতিহাসিক কিতাব *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*। শাইখ আবু মুহাম্মাদ কাযারূনী বলেন, 'যদি সমস্ত ইলম মুছে যেত, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* থেকে তা পুনরুদ্ধার করা যেত।' *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* অর্থ দ্বীনের ইলমসমূহকে পুনর্জীবন দান।

ইমাম গাযালী পরম বিশ্বাস ও সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ইউনানী দর্শন, বাতিনী মতাদর্শ ও ইলমুল কালামের প্রচলিত পুথিবিদ্যা থেকে হতাশ হয়ে একসময় বাগদাদ ছেড়ে নিরুদ্দেশ বেরিয়ে পড়েন। চতুর্দিকে তাঁরই নামে এত সুনাম ও সুখ্যাতির হাক-ডাক, অথচ তিনি খুঁজছিলেন তখন প্রকৃত জীবন। পরিবার-পরিচিতজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হণ্যে হয়ে ছুটেছেন সেই আকাঙ্ক্ষিত সত্যের সন্ধানে। এ-জন্য প্রথমে অচেনা এক পথিকের বেশে পাড়ি জমান দামেশকে। দামেশকের একটি মসজিদের আবদ্ধ কুঠুরিতে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুই বছর অতিবাহিত করেন। তিনি নিজে বলেন, 'দামেশকে আমি যে দুই বছর ছিলাম, এ-সম্পূর্ণ সময়

[১] *আল মুনকিয মিনাদ দলাল* : ৬৯।

আমার ব্রত ছিল একাকী অবস্থান, পরিচিত দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে দূরে সরে নিভৃতি যাপন, নিজের সাথে বোঝাপড়া, আত্মশুদ্ধি, অন্তরের চিকিৎসা, চরিত্রের সংশোধনমূলক হিসেব-নিকেশ ও আমলমগ্নতা। আমি তখন দামেশকের এক মসজিদে অবস্থান করতাম। মসজিদের উপরে একটি বদ্ধ কুঠুরিতে নির্জনতা অবলম্বন করতাম। কারো জন্যই অনুমতি ছিল না আমার সাথে দেখা করার। অতঃপর এক সময় সেখান থেকে বাইতুল মাকদিস চলে আসি। বেশ কিছুদিন বাইতুল মাকদিসে থাকার পর আমার মনে হজের জন্য ও পবিত্রতম শহর মক্কা-মদীনা দর্শনের জন্য অস্থিরতা তৈরি হয়। আমি অন্তরের সেই অস্থিরতা নিবারণে হজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।'[১]

প্রায় ১০ বছর যাবৎ পার্থিব সুনাম, সুখ্যাতি, সম্মান, পদমর্যাদা ও পরিবার-পরিচিতজনের হাতছানি উপেক্ষা করে, এক পথিকের মতো জীবনযাপন করে অবশেষে ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় বাগদাদ ফিরে আসেন। কিন্তু, তবু কি তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন সেই কাঙ্ক্ষিত সত্যের, যার জন্য সব কিছু পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলেন? এর উত্তরে ইমাম গাযালী বলেন, 'এই দীর্ঘ ১০ বছরের অনুসন্ধান শেষে আমি আবিস্কার করি, আমি যা খুঁজছি তা আছে একমাত্র এই সূফী-সাধকদের জীবনে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃত বিশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন, যার জন্য এই মানবজীবন; এই জ্ঞান, দর্শন, যুক্তি, তর্ক ও গবেষণা।'

এই সত্য অনুধাবনের পর যেন ইমাম গাযালী নিজের জ্ঞানের গন্তব্য খুঁজে পেলেন। ইতিপূর্বে যে-পুথিবিদ্যার পাহাড় তিনি রপ্ত করেছিলেন, তার রূহ ও হাকীকতের সন্ধান পেলেন। অতঃপর এই দুয়ের সমন্বয় করে দ্বীনের ইলমকে পুনর্জীবন দান করতে রচনা করলেন *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*। *ইহইয়ার* রচনাকাল মূলত ঐ আত্মগোপনের সময়কাল। ইবনু খালদূন লেখেন, 'যখন ফিকহ, আকীদা, তাফসীর ইত্যাদিসহ ইসলামের নানান শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ লিখিত হতে লাগল এবং তাসাওউফের লোকজনও কলম হাতে তুলে নিলেন, তখন হারিসী মুহাসিবীর মতো কেউ তাকওয়া, তাযকিয়া, আত্মার মুহাসাবা বিষয়ে লিখলেন। কুশাইরী ও সোহরাওয়ার্দীর মতো কেউ তরীকার আদব, আইন-কানূন নিয়ে লিখলেন। কিন্তু ইমাম গাযালী যখন কলম ধরলেন, তখন তিনি ঘটালেন সবকিছুর মাঝে এক বিস্ময়কর সমন্বয়। তাকওয়া, তাসাওউফ, তাযকিয়া, আদব, আখলাক—হেন কোনো বিষয় বাদ যায়নি যা তাঁর *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনে* নেই। এভাবেই প্রকাশ পেল

[১] *আল মুনকিয মিনাদ দলাল* : ১৩১।

ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন। এ-শাস্ত্রের জ্ঞান মানুষের হৃদয় থেকে গ্রন্থের পাতায় নামিয়ে আনলেন তিনি।'[১]

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী লেখেন, দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে ইমাম গাযালী যেই গভীর জ্ঞানের উপলব্ধি করেছিলেন, *ইহইয়া* তারই প্রতিফলন। সমাজের অবক্ষয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ কদর্যতা ও প্রকৃত ঈমানের অন্তরায় দূর করতে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর যে সমাধান আবিস্কার করেন, যেই অভাব অনুভব করেন, তারই প্রতিচ্ছবি *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*।

ইমাম যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী বলেন, '*ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* ইসলামের অন্যতম কিতাব।' ইমাম নববীও এ কিতাব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন।

এ-কারণেই তাঁর উস্তায ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনীর বক্তব্যমতে তিনি ছিলেন—'মহাসাগর'! তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার চোখে তিনি ছিলেন—'দ্বিতীয় ইমাম শাফিয়ী'! ইবনু কাসীরের মতে তিনি ছিলেন—'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন'! ইমাম যাহাবীর মতে তিনি ছিলেন—'যুগের বিস্ময়'!

তবে যে-কথাগুলো না বললেই নয়, তা হলো—মূল *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* অনেক ব্যাপক হয়ে গেলেও তার রচনাকালীন সময়ে ইমাম গাযালীর উপর সূফীবাদের প্রবল প্রভাব থাকায় তাতে কিছু বিষয় পরিমার্জনযোগ্য রয়ে গিয়েছিল। এই পরিমার্জনের প্রশ্ন কিছুটা তার উদ্ধৃত বর্ণনার দুর্বলতার ইঙ্গিতজ্ঞাপক হলেও অনেকাংশেই তা বিভিন্ন স্বার্থসাপেক্ষ ব্যাপার। অধিকন্তু এর কলেবরও ছিল বেশ বড়। মোটকথা, একদিকে কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তৃত আলোচনা, অপরদিকে বেশকিছু দুর্বল হাদীসের উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে যুগে যুগে উম্মাহর মুহাক্কিক আলিমগণ *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*কে সংস্কার করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এবং কেউ কেউ নিজেই তার বিভিন্ন সংস্কার-কাজ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ *ইহইয়া*র সারসংক্ষেপ *মিনহাজুল কাসিদীন* রচনা করেন। সংস্কারকৃত *ইহইয়া*র এই রূপটিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরবর্তী-কালে আরেক মুহাক্কিক আলিম ও ফকীহ ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ *মিনহাজুল কাসিদীন*-কে সংক্ষিপ্ত করে রচনা করেন *মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন*। আমাদের হাতের অনুবাদটি সংস্কারকৃত *ইহইয়া*র এই রূপটিরই অনুবাদ। তাই আমরা এর নামকরণ করেছি *সংক্ষিপ্ত ইহইয়াউ*

[১] *মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদূন* : ৪৬৯।

উলূমিদ্দীন। মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ তিন আলিমের পরিশ্রমের ফসল ও তাঁদের মেধার স্বাক্ষর এই কিতাব। এই বিষয়টি কিতাবের তাৎপর্যের আলোচনায় বাড়তি মাত্রা যোগ করবে, ইনশাআল্লাহ। কয়েকটি তথ্যের জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য শাইখ মীযান হারুন হাফিযাহুল্লাহ-এর। আল্লাহ কিতাবটিকে উম্মাহর জন্য উপকারী ও বরকতময় করুন। আমীন।

—আহমাদ রফিক
সম্পাদক, মাকতাবাতুল আসলাফ

বই প্রসঙ্গে

একজন মুমিনের জীবনে *মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন* কিতাবটির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বলে বা লিখে শেষ করার মতো নয়। এবং এই কিতাবের ভূমিকা ও তাৎপর্য এত সুস্পষ্ট যে, তা তার মূল কিতাব *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*-এর মতোই অনস্বীকার্য ও অবধারিত। আমরা এটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকতেই খুব তরুণ বয়সে পাঠ্য হিসেবে পড়েছিলাম। সেই তরুণ বয়সে পড়েছি আর বড় হয়ে তা থেকেই অন্যদের সবক দিয়েছি। বস্তুত, এই বইটি একজন মুসলিমের জীবন-চলার পূর্ণ দিকনির্দেশক। একজন মুমিনের ঘোর অন্ধকার পথের আলো। কী নেই এতে! ইসলামী আখলাক-চরিত্র, ইসলামের তারবিয়াত-শাসন থেকে শুরু করে একজন মুসলিমের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি-উপলব্ধি, জীবনের লক্ষ্য, আত্মার পরিশুদ্ধি, কাজের সুষ্ঠুতা-পরিশুদ্ধি নির্ণয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সন্নিবশিত করে রচিত এই কিতাব।

এর মূল কিতাব *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*-এর লেখক জগদ্বিখ্যাত মনীষী ইমাম আবু হামিদ আল গাযালী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৫০৫ হিজরী মুতাবিক খ্রিষ্টীয় ১১১১ সালে। ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম বা 'ইসলামের প্রমাণ' উপাধীতে ভূষিত। এবং সমকালীন বস্তুবাদ ও নাস্তিক্য দর্শনের কদর্যতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ইসলামী দর্শন-ফালসাফার জনক ও পুরোধা।

ইমাম গাযালীর *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* প্রথমে সংক্ষেপ করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী মুতাবিক ১২০১ ঈসাব্দে। তিনি মূল কিতাব থেকে মাওযূ হাদীসগুলো বাদ দিয়ে তথাস্থ সহীহ হাদীস উল্লেখ করতে চেষ্টা করেন। এবং মূল কিতাবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি পূর্ণ সচেতন থেকে কিছু ভিত্তিহীন গল্পের বর্ণনা অনুল্লেখ রাখেন। তিনি তাঁর কিতাবের নাম রাখেন *মিনহাজুল কাসিদীন*।

বক্ষ্যমাণ *মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন* মুলত তারই সংক্ষেপণ। এবং সেই সূত্রে এটি মূলত মুখতাসারুল মুখতাসার বা দ্বিতীয় সংক্ষেপণ। এটি করেন ছয় শ'

হিজরীর বিখ্যাত আলিম আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী রাহিমাহুল্লাহ। মৃত্যু ৬৮৯ হিজরী মুতাবিক খ্রিষ্টীয় ১২৯০ অব্দে। তিনি *মিনহাজুল কাসিদীন* থেকে শাখাগত ফিকহী মাসআলাগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূল আলোচনাগুলো বহাল রেখেছেন। এবং এই কাজে তিনি একজন ধী-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী ও অত্যন্ত দক্ষ-সচেতন আলিমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি মূল *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনের* প্রায় এক-দশমাংশ এই সংক্ষেপণে বাদ দিয়েছেন।

কিন্তু ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী নামে আবদুর রহমান ইবনু কুদামা ছাড়াও একাধিক ইমাম প্রসিদ্ধ। যেমন : হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী। যিনি *মুখতাসারুল খিরাকীর* ব্যাখ্যাভাষ্য ও আট খণ্ডে মুদ্রিত হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহগ্রন্থ *আল-মুগনীর* লেখক। *আল-মুগনী* শুধু হাম্বলী মাযহাবই নয়, ফকীহ সাহাবী ও তাবিয়ীদেরও অমূল্য, বিরল এক ফিকহী মতসমৃদ্ধ গ্রন্থ। তুলনামূলক ফিকহ ও তার দলিলাদি সংক্রান্ত কিতাবের তালিকা থেকে ইমাম নববীর *আল-মাজমূ*, ইবনু হাযমের *আল-মুহাল্লা* ও ইবনু রুশদের *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*-কে বাদ দিলে *আল-মুগনীর* কোনো তুলনা নেই। *আল-মুগনীর* লেখক ইমাম ইবনু কুদামা মৃত্যুবরণ করেন ৬২০ হিজরী মুতাবিক ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছাড়া আরেকজন ইবনু কুদামা হলেন *আল-মুকনি*-এর ভাষ্যগ্রন্থ, আল-মানার প্রকাশনা সংস্থা থেকে বারো খণ্ডে *আল-মুগনীর* সাথে মুদ্রিত *আশ-শারহুল কাবীর*-এর লেখক শামসুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনু কুদামা। তাঁর মৃত্যু ৬৮২ হিজরী মুতাবিক ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

মূল কিতাব *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*-কে ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ ছাড়া আরো অনেকেই সংক্ষেপ করেছেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, জামালুদ্দীন আল-কাসিমী দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন *মাওইযাতুল মুমিনীন মিন ইহইয়াই উলূমিদ্দীন*। এটিও মূল কিতাবের অত্যন্ত চমৎকার একটি সংক্ষেপণ। এই সংক্ষেপণে এমন একজন বিজ্ঞ লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি মূল কিতাবের মৌলিক শিরোনাম ও যাবতীয় বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংক্ষেপণে নিজের ইলমী দক্ষতা সমুজ্জ্বল রেখেছেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি তার এই সচেতনতার কথা এভাবে বলেন —

‘জনসাধারণকে দ্বীন বোঝানো বেশ ভারি ও দুরূহ কাজ। একাজের জন্য বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার বিকল্প নেই। একজন মুরশিদ কিংবা ওয়ায়েয কিংবা নাসীহাতকারী মূলত কী? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, তিনি একাধারে আল্লাহর সীমা-পরিসীমার রক্ষক,

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরিচালক, মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধকারক, মন-নিয়ন্ত্রক, বোধ-সঞ্চালক, আকীদা-সংস্কারক, ইবাদাতের ভেদ ও রহস্যের উন্মোচক ও তাদের পুরোনো জ্ঞানের ঘাটতি ও ভ্রান্তির সম্পূরক-সংশোধক।'

মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন-এর বিষয়বস্তু—ইবাদাত, আদাত তথা দৈনন্দিন জীবনের নানা খুটিনাটি, আয়-উপার্জন, সামাজিক সংস্কার-সংশোধন, আকীদা ও ব্যবহারিক শিষ্টাচারের পরিশুদ্ধি-পরিমার্জন, আধ্যাত্মবাদ, ইতিহাস ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ব্যপ্ত। শেষ যে-পরিচ্ছেদটি, তাতে আছে আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার বয়ান।

ইসলামী ফিকহ সংশ্লিষ্ট যে-বিষয়গুলো এই বইয়ে বিবৃত হয়েছে, তা—নিয়ত, নিয়তের হাকীকত, ফযীলত, ইখলাস, সততা, এবং সালাত ও সালাতের আদব, শারয়ী রহস্য, সাওমের শারয়ী তাৎপর্য ও রহস্য, যাকাতের গুরুত্ব, যাকাতের অন্তর্গত ভেদ, তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত এবং দানদক্ষিণার মাহাত্ম্য, হজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ফযীলত ও সার্বিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ, তাওবা, তাওবার শর্ত, রুকন, পাপের স্তর, প্রকরণ, এবং সে অনুযায়ী আখিরাতে মানুষের অবস্থান ও অধিষ্ঠান নিজের সাথে মুজাহাদা-লড়াই সংক্রান্ত।

দৈনন্দিন জীবনের বিধি-নিষেধ ও শিষ্টাচার প্রসঙ্গে আছে খাওয়ার আদব, কারো সঙ্গে মেশার আদব, বৈবাহিক জীবনের আদব-উদ্দেশ্য-উপকার ও সন্তানের হক ও এ-সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ের আদব। আয়-উপার্জনের আদব, হালাল-হারাম ও সফর-ভ্রমণের আদব ইত্যাদি।

সামাজিক সংশোধনমূলক আলোচনার আওতায় আছে, ভ্রাতৃত্বের দাবি, সঙ্গ-সংস্রবের আদবকেতা, মুসলিমের উপর মুসলিমের অধিকার, আত্মীয়তার অধিকার, প্রতিবেশ ও প্রতিবেশীর অধিকার, সামা'-সংগীতের বিধি-বিধান ও আদব এবং দৈনন্দিন সামাজিক জীবনযাপনের অন্যান্য আদব। এই আলোচনায় 'আখলাকুন নুবুওওয়াহ' বা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহামহিম চরিত্র প্রসঙ্গ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রসঙ্গসহ মানুষের প্রাত্যহিক বিভিন্ন অভ্যাস-আচরণের কথাও আছে।

তাসাউফ বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে—নির্জনতা ও জনসমাগমে থাকার শরয়ী দৃষ্টিকোণ, প্রবৃত্তির সাথে লড়াই, কু-স্বভাব পরিবর্তন, অন্তরের রোগ নিরাময়, পেট ও লজ্জাস্থানের প্রবৃত্তি নিবারণ, দুনিয়ার নিন্দা, মুমিনের আশা ও ভয়,

দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়াবিমুখতার হাকীকত, তাৎপর্য ও বিভিন্ন স্তর-প্রকরণ, দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার ভারসাম্য, অপ্রয়োজনে কারো কাছে যাচনা করার হারাম বিধি, প্রয়োজনে যাচনা করার আদব, মুহাব্বাত-অনুরাগ, মুহাসাবা-মুরাকাবা, নিজের হিসাব-নিকাশ করা, ভুলের জন্য নিজেকে তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা, মৃত্যুর স্মরণ ও পারলৌকিক জীবনের বিবিধ বাস্তবতা, কবরের পরিবেশ, মৃত ব্যক্তির অবস্থা, আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধির উপায়, এবং এ-ক্ষেত্রে মানুষের পরস্পরের তারতম্য, আল্লাহর মারিফাত অর্জনে মানুষের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি আলোচনা।

কিতাবের অধিকাংশ আলোচনাই নির্দেশ করে, মানবজাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ—ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্রের উন্নয়ননির্ভর। এবং তা আকীদা, ইবাদাত ও মুআমালাতের জন্যেও সম্পূরক বৈশিষ্ট্য। কিতাবের প্রতিটি আলোচনা কুরআন ও সুন্নাহর ঝর্ণাপ্রবাহ থেকে প্লাবিত। তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও এতে চরিত্রের উন্নয়ন, উত্তম চরিত্রের লক্ষণ, যবানের আপদসমূহ, গীবত ও নামীমা (পরনিন্দা)-এর নিন্দনীয়তা, রাগ-হিংসা-বিদ্বেষ-অহংকার-আত্মতৃপ্তির ভর্ৎসনা, কার্পণ্য-লোভ-লালসার জঘন্যতা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাহাত্ম্য, যশ-খ্যাতির কুৎসা ও সবর-শোকরের ফযীলত বিবৃত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে নিয়ামতের হাকীকত ও অসংখ্য প্রকরণ সম্বন্ধেও। আকীদা বিষয়ে তাওহীদের গুরুত্ব, ফিকিরের তাৎপর্য এবং তাওয়াক্কুলের প্রতি জোরারোপ করা হয়েছে।

তাছাড়া এই কিতাবে অত্যন্ত নিপুণভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত, ওফাতের পূর্বাপরের ঘটনাবলি, খুলাফায়ে রাশিদীনের ওফাত ও ওফাতকালীন ইতিহাস, এবং সামগ্রিকভাবে মৃত্যু ও মৃত্যু-বিষয়ক বিবিধ বাণী-উপদেশ এবং মৃত্যুপরবর্তী জগৎ—জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মোদ্দাকথা, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার বিচারে এটি অত্যন্ত বিরল একটি কিতাব; এতে একইসাথে তারবিয়াত, আখলাক, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর সাথে বান্দার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক-তত্ত্ব, ইবাদাত, মুআমালাত, আকীদা, তাসাউফ—এককথায় একজন মুসলিম কুরআনের চরিত্র ধারণ করতে এবং নববী বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হতে যে-যে বিষয়ের মুখাপেক্ষী, তার প্রতিটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এই কিতাবে।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে, উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্মকে, উম্মাহর তরুণ-যুবা, আলিম-উলামা সকলকে কিতাবটিকে নিজের জীবনে অনিবার্য করে নেওয়ার

তাওফীক দিন। তিনি চিরপবিত্র, তিনিই সঠিক পথে চলার তাওফীকতাদাতা।[১]

—ড. ওয়াহবাহ মুস্তাফা যুহাইলী রাহিমাহুল্লাহ

প্রবীণ সিরিয়ান আলিম, সাবেক ইসলামী ফিকহ ফ্যাকাল্টি-প্রধান,
দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] গুরুত্বপূর্ণ এই ভূমিকাটির অনুবাদ করেছেন আহমাদ রফিক।

প্রথম ভাগ

ইবাদাত

অধ্যায় : ইলম

ইলম অর্জনের ফযীলত, গুরুত্ব ও ইলম সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনা

ইলম অর্জনের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

> *হে নবী, আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে?*[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

> *তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।*[২]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'সাধারণ মুমিনদের চেয়ে আলিমদের মর্যাদা সাত শত স্তর ওপরে। প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব।'

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

> *আল্লাহর বান্দাগণের মধ্য থেকে কেবল আলিমগণই তাঁকে ভয় করেন।*[৩]

[১] সূরা যুমার : ৯।
[২] সূরা মুজাদালাহ : ১১।
[৩] সূরা ফাতির : ২৮।

হাদীস শাস্ত্রের বিশুদ্ধতম দুই গ্রন্থ *বুখারী* ও *মুসলিমে* মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।' [১]

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুই ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো। তাদের একজন সাধারণ আবিদ (ইবাদাতপ্রাণ) এবং অপরজন আলিম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার যতটা মর্যাদা, ঠিক ততটা মর্যাদা একজন সাধারণ আবিদের ওপর একজন আলিমের।" অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমান-যমিনের সকল বাসিন্দা, এমনকি গর্তের পিঁপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ এমন ব্যক্তির জন্য দুআ করে, যে মানুষকে কল্যাণ (ইলম) শিক্ষা দেয়।' [২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'একজন আবিদের চেয়ে একজন আলিম মর্যাদায় এত শ্রেষ্ঠ, যেমন পূর্ণিমার চাঁদ অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ কোনো দিনার অথবা দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যাননি। তাঁরা রেখে গেছেন ইলমের উত্তরাধিকার। ফলে যে এই ইলমের উত্তরাধিকারী হবে, সে-ই সবচেয়ে লাভবান হবে।' [৩]

সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ফিরিশতাগণ তালিবুল ইলম (ইলম অন্বেষণকারী)-এর জন্য সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন।' [৪]

ইমাম খাত্তাবী বলেন, এখানে ফিরিশতাদের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার তিনটি অর্থ হতে পারে—

এক. প্রকৃত অর্থেই ডানা বিছিয়ে দেওয়া।

দুই. ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি ফিরিশতাদের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ।

তিন. আকাশ থেকে ইলমের মজলিসসমূহে তাঁদের অবতরণ।

---

[১] *বুখারী* : ৭১; *মুসলিম* : ১০৩৭।

[২] *তিরমিযী* : ২৬৭৫; ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও ভালো বলে মন্তব্য করেছেন।

[৩] *তিরমিযী* : ২৬৮২; *আবু দাউদ* : ৩৬৪১; *ইবনু মাজাহ* : ২২৩।

[৪] *আবু দাউদ* : ৩৬৪১; *তিরমিযী* : ২৬৮২; *ইবনু মাজাহ* : ২২৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭১৫।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি ইলম অন্বেষণের পথ অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত লাভের পথ সুগম করে দেবেন।' [১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'কেউ যদি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম অন্বেষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জান্নাতে তার মাঝে এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের মাঝে মাত্র একটি স্তরের ব্যবধান থাকবে।' [২] ইলম অর্জনের মর্যাদা-বিষয়ক আরো অনেক বর্ণনা আছে। একারণে ইলমের ফযীলত ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে অনেক জ্ঞানীকে বলতে শোনা যায়—'হায়! আমি বুঝি না, যে ইলম অর্জন করেনি সে কী পেয়েছে, আর যে ইলম অর্জন করেছে তার কী হাত ছাড়া হয়েছে?'

ইলম শেখানোর ফযীলত

ইলম শেখানোর ফযীলত সম্পর্কে *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিমে* সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি তোমার মাধ্যমে কাউকে হিদায়াত দেন, তাহলে সেটি তোমার মালিকানায় একটি উৎকৃষ্ট উট আসার চেয়েও কল্যাণকর।' [৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয় তার জন্য সকল প্রাণী এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে।' [৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদীসেও এমনটি উল্লেখ হয়েছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সমুদ্রের মাছ কেন ইলমের শিক্ষকের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবে?

তাহলে উত্তর হচ্ছে, ইলমের উপকার সবার জন্য ব্যাপক, এমনকি মাছের জন্যও।

[১] *মুসলিম* : ২৬৯৯; *তিরমিযী* : ২৬৪৬; *ইবনু মাজাহ* : ২২৫।

[২] হাদীসটি যঈফ। ইমাম দারিমী হাদীসটি হাসান বসরী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবরানী তাঁর *আওসাত* গ্রন্থে ইবনু আব্বাস থেকে মারফু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন : ৯/১৭৪। এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল জা'দ নামক একজন রাবী তথা বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি একজন মাতরুক রাবী।

[৩] *বুখারী* : ৪২১০; *মুসলিম* : ২৪০৬।

[৪] *আল মুজামুল আওসাত* : ৬২১৫, শাইখ শুআইব আরনাউত হাদীসের সনদকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন; টীকা, *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭১৫।

কেননা, আলিমগণ ইলমের মাধ্যমে হালাল ও হারামের পরিচয় লাভ করেন এবং প্রতিটি বস্তুর প্রতি এমনকি জবেহকৃত প্রাণী এবং মাছের প্রতিও দয়ার্দ্র আচরণ করতে নির্দেশ দেন। তাই আলিমগণের এই উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলা সবার প্রতি তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করার প্রত্যাদেশ করেন।

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ইলম ও হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাটিতে বৃষ্টি পড়ার মতো। কিছু মাটি বৃষ্টি গ্রহণ করে, ফলে তা অনেক খাদ্য ও ঘাস উৎপন্ন করে। কিছু মাটি হয়ে থাকে শক্ত ও অনুর্বর। সেগুলো নিজে উপকৃত না হলেও পানি ধারণ করে রাখে। ফলে মানুষ তার মাধ্যমে উপকার লাভ করে। তারা সেখান থেকে নিজে পান করে, অন্যকে পান করায় এবং চাষাবাদ করে। তৃতীয় আরেক প্রকারের মাটিতে বৃষ্টি পতিত হয়, যেগুলো শুষ্ক-রুক্ষ মরুভূমি। না পানি ধরে রাখে আর না নিজে ফসল উৎপাদন করে। এটা হচ্ছে সেই তিন শ্রেণির মানুষের উদাহরণ যাদের প্রথম দুই শ্রেণি আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে আমার নিকট প্রেরিত ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত করেন। সে নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায়। আর তৃতীয় শ্রেণি হলো, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করে না এবং আমি আল্লাহ তাআলার যে হিদায়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা গ্রহণ করে না।' *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিমে* হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১]

এ হাদীসটির প্রতি লক্ষ করুন। আমাদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এটা অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের সমাজেও তিন শ্রেণির মানুষ রয়েছে। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে ফুকাহায়ে কিরাম। তাঁরা হাদীসে বর্ণিত প্রথম প্রকারের মাটির মতো। অর্থাৎ, যে মাটি পানি গ্রহণ করে খাদ্য এবং শস্য উৎপন্ন করার মাধ্যমে আমাদের উপকার করে। কেননা, তাঁরা নিজেরা যা জানেন এবং বোঝেন তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুহাদ্দিসগণ; যাঁরা ফিকহের গুণে গুণান্বিত হতে পারেননি। তাঁরা দ্বিতীয় প্রকারের মাটির মতো। যা পানি সংরক্ষণ করে রাখে। মানুষ তার মাধ্যমে উপকৃত হয়। আর তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ লোকজন। তারা তৃতীয় প্রকারের মাটির মতো। যা শুষ্ক মরুভূমি; পানি ধরে রাখতে পারে না এবং তা থেকে কোনো খাদ্যও উৎপন্ন হয় না।

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আলিমগণ না থাকলে মানুষ জীব-জন্তুর মতো হয়ে

[১] *বুখারী* : ৭৯; *মুসলিম* : ২২৮২।

যেত।' মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তোমরা ইলম শিক্ষা করো, কেননা আল্লাহর জন্য ইলম শিক্ষা করা আল্লাহভীতির অন্তর্ভুক্ত। ইলম অন্বেষণ করা ইবাদাত। ইলমের চর্চা হলো তাসবীহ জপার মতো আর ইলমের সন্ধানে সফর করা জিহাদের মতো। অন্যকে ইলম শিক্ষা দেওয়া সাদাকাহ। আহলুল ইলম তথা আলিম ও ছাত্রদের কাছে ইলম প্রচার করা সওয়াবের কাজ। ইলম একাকিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী।

কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, 'হে মূসা, তুমি কল্যাণের শিক্ষা অর্জন করো এবং অন্যকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমি কল্যাণের শিক্ষাদানকারী এবং অর্জনকারী উভয়ের কবর আলোকিত করব। যেন তারা তাদের কবরের অন্ধকারে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়।' [১]

কোন ইলম অর্জন করা ফরয?

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ' ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।' [২]

ইমাম গাযালী বলেন, এখানে ইলম বলতে কোন ধরনের ইলম উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ফকিহগণ বলেন, এটি হচ্ছে ইলমুল ফিকহ। কেননা, ফিকহের মাধ্যমে শরীয়তের হালাল-হারাম সম্বন্ধে জানা যায়।

মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসগণ বলেন, এটি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম। কেননা এ দুটির মাধ্যমেই অন্যান্য সকল ইলম অর্জন করা যায়।

সূফীগণ বলেন, এটি হচ্ছে ইখলাস এবং অন্তরের রোগ সংক্রান্ত ইলম।

কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে, এটি হচ্ছে ইলমে কালাম। এ ধরনের আরো অনেক মত

[১] বিভিন্ন হাদীসে ইলমকে 'কল্যাণ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই অনুবাদেও তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

[২] *ইবনু মাজাহ* : ২২৪। বুওয়াইসিরী রাহিমাহুল্লাহ *যাওয়াইদ* গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ, এতে হাফস ইবনু সুলাইমান নামক দুর্বল রাবী রয়েছেন। ইমাম সুয়ূতী বলেন, শাইখ মুহিউদ্দীন নববী রাহিমাহুল্লাহকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। যদিও অর্থের দিক দিয়ে তা সঠিক। ইমাম নববীর ছাত্র জামালুদ্দীন মিজ্জী বলেন, এই হাদীসটি এত অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তা হাসানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইমাম সুয়ূতী বলেন, তিনি (জামালুদ্দীন মিজ্জী) যেমনটি বলেছেন তাই ঠিক। আমি নিজেই এই হাদীসের পঞ্চাশটি সনদ দেখেছি এবং তা একত্র করেছি।—সম্পাদক

রয়েছে যেগুলোর একটিও সন্তোষজনক নয়। বরং সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হলো, ফরয ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ইলম, যার মাধ্যমে বান্দা তার প্রতিপালকের প্রতি আপন কর্তব্যগুলো সম্বন্ধে অবহিত হয়।

বান্দার কর্তব্য অনুযায়ী ইলম অর্জন করা আবশ্যক

আল্লাহর প্রতি বান্দার কর্তব্য তিন ধরনের—আকীদাগত, করণীয় ও বর্জনীয়।

একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়, শাহাদাতের দুই কালিমা শেখা এবং সেগুলোর অর্থ বোঝা। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা তার জন্য জরুরি নয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব বেদুইনদের কাছ থেকে শুধুমাত্র তাওহীদ-রিসালাতের সাক্ষ্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কোনো দলীলের শিক্ষা তাদেরকে দেননি। শাহাদাতের দুই কালিমা শিক্ষা করা হচ্ছে প্রাথমিক সময়ের জন্য ফরয। পরবর্তীকালে তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং দলীল জেনে নেওয়া আবশ্যক।

করণীয় বিষয়ক ইলম—পর্যায়ক্রমে যখন একজন মানুষের করণীয় হিসেবে নামাযের সময় আসবে তখন তার উপর পবিত্রতা অর্জন করা এবং নামাযের শিক্ষা নেয়া আবশ্যক। রামাদান মাস এসে গেলে তার উপর রোযার শিক্ষা নেয়া আবশ্যক। যদি তার কোনো সম্পদ থাকে এবং সেই সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তার উপর যাকাতের শিক্ষা নেয়া আবশ্যক। যদি হজের সময় চলে আসে আর সে হজ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য হজের বিধি-বিধান শিক্ষা করা আবশ্যক।

বর্জনীয় বিষয়ক ইলম—অবস্থার ভিন্নতা হিসেবে বর্জনীয় সম্বন্ধে ইলম অর্জনের আবশ্যকীয় মাত্রা ভিন্ন হবে। যেমন অন্ধের জন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম, তা শেখা জরুরি নয়। বোবার জন্য কী কী বলা হারাম, তা শেখা আবশ্যক নয়। যদি সে এমন কোনো দেশে অবস্থান করে যেখানকার লোকেরা মদ পান এবং রেশম পরিধানে অভ্যস্ত, তখন তার জন্য তা হারাম হওয়া সম্পর্কে জেনে নেয়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আকীদাগত ইলম—অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী আকীদাগত ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিধিত হয়। যদি দুই কালিমার অর্থের ব্যাপারে কারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই সন্দেহ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম

অর্জন করা তার উপর আবশ্যক। অনুরূপ যদি কেউ এমন কোনো দেশে অবস্থান করে যেখানে বিদআতের সয়লাব তখন তার জন্য সত্য এবং সঠিক সুন্নাহর ইলম অর্জন করা আবশ্যক। যদি কেউ এমন কোনো দেশে ব্যবসা করে যেখানে সুদের লেনদেন অধিক তাহলে তার জন্য তা থেকে কীভাবে বিরত থাকা যায় সেই ইলম শিক্ষা করা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

একইভাবে পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নামের ঈমান সম্পর্কে ইলম অর্জন করাও আবশ্যক।

সবার উপর অর্জন করা ফরয ইলম কী?

আমাদের উক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হলো—প্রত্যেক বান্দার জন্য যে ইলম অর্জন করা আবশ্যক তা-ই ফরযে আইন ইলম। অথবা 'ফরযে আইন' ইলম হচ্ছে এমন ইলম যা অর্জন করা ব্যতীত বান্দার গত্যন্তর নেই।

পক্ষান্তরে উক্ত আলোচনার বাইরে যে সকল ইলম আছে তা অর্জন করা বান্দার জন্য ফরযে কিফায়াহ। 'ফরযে কিফায়াহ' ইলম হচ্ছে এমন ইলম, দুনিয়াবী স্বার্থে যা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা যায় না, যেমন : চিকিৎসা শাস্ত্র (শারীরিক সুস্থতার জন্য এই ইলম শেখা জরুরি), হিসাববিদ্যা (উত্তরাধিকার ও ওসীয়তের সম্পদ বণ্টনের জন্য এ বিদ্যা শেখা জরুরি)।[১]

যদি কোনো দেশে এ সকল বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিও না থাকে, তাহলে সে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিও এগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয় তাহলেই যথেষ্ট। তখন অন্যদের উপর থেকে সেই ফরয কাজের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও হিসাববিদ্যা শিক্ষা করা যে ফরযে কিফায়া পর্যায়ের এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা কৃষি, সেলাই প্রভৃতি শিল্প সম্পর্কে ইলম অর্জন করাও ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হিজামা অর্থাৎ শিঙ্গা লাগানো সম্পর্কে ইলম অর্জন করাও ফরযে কিফায়া। যদি কোনো দেশে হিজামা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেউ না থাকে তাহলে বিশাল বিপত্তি দেখা যাবে। যিনি অসুখ দিয়েছেন তিনি ওষুধও দিয়েছেন এবং তা ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তবে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে গভীরভাবে জ্ঞানার্জন

[১] ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়াহ শরীয়তের দুটো পরিভাষা। ফরযে আইন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা ব্যক্তিভেদে সবার ওপর আবশ্যক। ফরযে কিফায়াহ হলো, পৃথকভাবে প্রত্যেকের উপর যেটা আবশ্যক নয়, বরং এখানে কর্ম মুখ্য, কিছু মানুষ আদায় করলে অন্যদের ওপর তা আর আবশ্যক থাকে না।

করাকে অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ এ থেকে অমুখাপেক্ষী হলে কোনো সমস্যা হবে না।[১]

অনাবশ্যক ইল্ম ও অবৈধ ইল্ম

কিছু কিছু জ্ঞান আছে যা চর্চা করা ওয়াজিবও নয়, হারামও নয়। বরং বৈধ এবং জায়িয। যেমন : রুচিশীল কাব্য কিংবা ইতিহাস চর্চা ইত্যাদি। আবার এমন কিছু জ্ঞান আছে যা চর্চা করা নিন্দনীয়। যেমন : যাদুমন্ত্র, তেলেসমাতি, নযরবন্দ ইত্যাদি।

উলূমে শারইয়্যাহ[২]

তবে উলূমে শারইয়্যাহ তথা শরীয়ত-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জ্ঞানই প্রশংসনীয়। এগুলো চার ভাগে বিভক্ত : মৌলিক, শাখাগত, প্রাথমিক এবং পরিশিষ্টমূলক।

- পবিত্র কুরআন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের সকলের ঐকমত্য এবং সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য হচ্ছে মৌলিক উলূমে শারইয়্যাহ।
- আর মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞান ও প্রস্তাবনা হচ্ছে শাখাগত উলূমে শারইয়্যাহ। যেমন : 'কাযী যেন রাগান্বিত অবস্থায় কোনো ফায়সালা না করে'—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীস থেকে শাখাগত একটি মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। তা হচ্ছে, কাযী যেন ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ফায়সালা না করে। তো এই শ্রেণির ইলম হচ্ছে শাখাগত উলূমে শারইয়্যাহ।[৩]
- যে সকল শাস্ত্র মৌলিক শাস্ত্র শেখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে—যেমন : ব্যাকরণ শাস্ত্র এবং ইলমুল লুগাহ তথা ভাষা শাস্ত্র—সেগুলো হচ্ছে প্রাথমিক উলূমে শারইয়্যাহ। এ দুটি ইলম পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বোঝার সহায়ক ইলম।

---

[১] ইমাম গাযালীর কথা আক্ষরিকভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। বরং মূলনীতি হিসেবে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অবস্থাভেদে বিধান ভিন্ন হবে। যেমন : বর্তমান সময়ে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন ফরযে কিফায়াহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর বিপরীতে শিঙ্গার যেই আবেদন লেখক তুলে ধরেছেন সেটা তাঁর সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে শিঙ্গা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও সেই যুগের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।—সম্পাদক

[২] 'উলূম' হচ্ছে 'ইলম' শব্দের বহুবচন। ইলম অর্থ জ্ঞান। উলূমে শারইয়্যাহ অর্থ, শরীয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান।

[৩] *বুখারী* :৭১৫৮; *মুসলিম* : ১৭১৭; *আবু দাউদ* :৩৫৮৯; *তিরমিযী* : ১৩৩৪; *নাসায়ী* : ৫৪০৬; *ইবনু মাজাহ* : ২৩১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৪৮৫।

⁂ কিরাআত শাস্ত্র (যে শাস্ত্রের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা যায়) হচ্ছে পরিশিষ্টমূলক উলূমে শারইয়্যাহর শ্রেণিভুক্ত।

আরবী হরফের মাখরাজ সংক্রান্ত ইলম, হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণ এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানা—এগুলোও উলূমে শারইয়্যাহ। এর প্রত্যেকটিই প্রশংসনীয়।[১]

ইলমুল মুআমালা

ইলমুল মুআমালার গুরুত্ব

এবার আসি ইলমুল মুআমালা অর্থাৎ অন্তরের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত ইলমের আলোচনায়। অন্তরের বিভিন্ন অবস্থা হলো— ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সততা এবং একনিষ্ঠতা প্রভৃতি। তো ইলমুল মুআমালা হচ্ছে সেই ইলম, যার মাধ্যমে বড় বড় আলিমগণের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। এই ইলম অনুয়ায়ী আমল করার দ্বারাই গোটা দুনিয়ায় তাঁদের সুখ্যাতি ছড়িয়েছে। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

আর (আধ্যাত্মিকতা বঞ্চিত) আলিমদের মর্যাদা উপর্যুক্ত প্রথম শ্রেণির আলিমদের তুলনায় নিচে। কারণ তাঁরা বাহ্যিক ইলম নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিলেন, হাকীকত ও অন্তরের ইলম নিয়ে ততটা ব্যস্ত ছিলেন না। এ কারণে আপনি দেখতে পাবেন, একজন ফকীহ যিহার (স্ত্রীর পিঠকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা), লিআন[২]-সহ এমন অসংখ্য মাসআলার অনুসন্ধান এবং সেগুলো থেকে শাখা-প্রশাখা বের করার পেছনে সময় ব্যয় করছেন, যুগের পর যুগ কেটে গেলেও যেগুলোর প্রয়োজন হবে না। অথচ বিপরীতে তিনি ইখলাস নিয়ে কোনো কথা বলেন না। রিয়া (লৌকিকতা) থেকে সতর্ক থাকেন না। অথচ এগুলো ছিল তাঁর জন্য ফরযে আইন

[১] 'মাখরাজ' হলো, হরফ উচ্চারণের রীতি। 'রাবী' : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

[২] পরিভাষায় লিআন অর্থ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে কসম করা। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ আনে কিন্তু তার অন্য কোনো সাক্ষী থাকে না তখন তাকে কাযীর অর্থাৎ বিচারকের সামনে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হয় যে, সে নিজে সত্যবাদী। অতঃপর পঞ্চমবার কসম করে বলতে হয়, যদি সে সত্যবাদী না হয় তাহলে তার উপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ পতিত হবে। যদি স্ত্রী তার উপর আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় তাহলে সেও চারবার শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যা বলছে। অতঃপর পঞ্চমবারে গিয়ে বলবে, যদি স্বামী সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর লানত পতিত হবে। -সূরা নূর : ৬-৯।

আর প্রথমটি ফরযে কিফায়া। যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইখলাস ও রিয়ার মতো এসব বিষয়ে তিনি কেন সময় দিচ্ছেন না, তাঁর কাছে কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। অপরদিকে যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, লিআন, যিহার ইত্যাদি মাসআলাতে কেন সময় ব্যয় করছেন, যেগুলো সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তিনি উত্তরে বলবেন, এগুলো ফরযে কিফায়া ইলম।

তাঁর কথা সত্য। কিন্তু তিনি বোধহয় জানেন না, গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করাও ফরযে কিফায়া। তাহলে তিনি তা নিয়ে কেন ব্যস্ত হলেন না? বোঝা গেল, তাঁর উপর প্রবৃত্তির চাহিদাও প্রাধান্য পেয়েছে কিছু। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোক-দেখানো এবং আলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা। যা তাঁর এসব মাসআলা নিয়ে মুনাযারা করার দ্বারা অর্জিত হচ্ছে, গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে হয়তো হচ্ছে না বা হবে না।

কিছু শব্দের অপব্যাখ্যা

বর্তমানে ইলম সংক্রান্ত কিছু শব্দের অর্থে পরিবর্তন এবং বিকৃতি সাধন করা হয়। এবং তার এমন অর্থ করা হয় যা সালাফে সালিহীনের করা অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শব্দগুলো হলো—

ফিকহ

ফিকহ শব্দটিকে শুধু বিভিন্ন মাসআলা ও তার শাখা-প্রশাখা এবং কার্যকারণ জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ প্রথম যুগে ফিকহ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই শাস্ত্রের জন্যেও, যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আখিরাতের পথ সম্পর্কে জানা যায়, অন্তরের রোগ ও আমল বিনষ্টকারী কারণ সম্পর্কে জানা যায়। যার মাধ্যমে অর্জিত হয় দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করার শক্তি। সৃষ্টি হয় পরকালের নিয়ামত সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ। আর প্রবল ভীতি সঞ্চারিত হয় অন্তরে।

এজন্য হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ফকীহ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি দুনিয়াবিমুখ। আখিরাতের ব্যাপারে উৎসুক। নিজ ধর্মের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। সর্বদা প্রভুর ইবাদাতে নিরত। মুসলিমদের সম্মান বিনষ্ট করা থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনকারী। মুসলিমদের সম্পদের লোভ থেকে মুক্ত ও তাদের কল্যাণকামী।' এভাবে ফিকহ বলতে মূলত আখিরাতের ইলম বোঝানো হতো। বিস্তৃত অর্থে না ধরলে ফাতওয়া সংক্রান্ত ইলম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু এখন সীমাবদ্ধতা সৃষ্টির

ফলে লোকদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, অন্যান্য ইলম থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে শুধু ফতওয়া প্রদানের ইলমই হচ্ছে ইলমে ফিকহ।

۞ ইলম

ইলম শব্দটি ব্যবহার করা হতো আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর নিদর্শনাবলি, তাঁর নিয়ামতসমূহ এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার করণীয় সম্পর্কে জানার উপর। কিন্তু তাঁরা এটিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিকহের মাসআলা জানার নামই দিয়েছেন ইলম। তাফসীর ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না সেটি দেখারও প্রয়োজন বোধ করেননি।

۞ তাওহীদ

সালাফের যুগে তাওহীদ বলতে বোঝানো হতো, পৃথিবীর সকল আসবাব ও উপকরণ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়াকে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করাকে, তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাকে। অথচ এটিকে আজ এমন শব্দ বানিয়ে ফেলা হয়েছে যার মাধ্যমে কেবল আকীদার তার্কিক হওয়া যায়, যা সালাফের নিকট একটি গর্হিত কাজ ছিল।[১]

۞ তাযকীর ও যিকির

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

> *তোমরা আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ করো। কেননা যিকির মুমিনের জন্য উপকারী।*[২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা রিয়াযুল জান্নাহ (জান্নাতের টুকরো)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তাসবীহ পাঠ কোরো।' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'রিয়াযুল জান্নাহ কী?' তিনি বললেন, 'যিকিরের মজলিসসমূহ।'[৩] অথচ এখন যিকির দ্বারা বুঝানো হয় নানা ঘটনা,

---

[১] ইমাম গাযালী রহিমাল্লাহ'র উপর্যুক্ত বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। আজও তাওহীদ ও আকীদা শেখা ও শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বিরোধীকে দমন ও পরাজিত করা, প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক ও দলীলের খেলায় জেতাই মুখ্য। আমলের বিষয়টি গৌণ। আল্লাহ রহম করুন।—সম্পাদক

[২] সূরা জারিয়াত : ৫৫।

[৩] *তিরমিযী* : ৩৫১০।

কেচ্ছা-কাহিনী আর গল্পকারদের আসরের নানা বানোয়াট রূপকথাকে।

ওয়াজ-নসীহতের মধ্যে পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা বলতে গিয়ে আগ্রহভরে যে সকল কেচ্ছা-কাহিনী বলা হয় তার অধিকাংশই প্রমাণিত নয়। কথিত আছে, (যুলাইখা যখন ইউসুফের কক্ষে প্রবেশ করে তখন) ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের পায়জামার ফিতা খুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে আঙুল কামড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে সম্বিত ফিরে পান! আবার দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর একজন সেনার স্ত্রীকে হরণ করার জন্য তাঁকে যুদ্ধে পাঠান এবং হত্যা করেন। আদতে এসব বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী সাধারণ মানুষের ক্ষতি বৈ কোনো উপকার করে না।

একই কথা প্রযোজ্য তথাকথিত 'শাতহ' তথা সূফী-প্রলাপের ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো চরম ক্ষতিকর। কেননা এসবের মধ্যে প্রেম, বিরহ ও বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার কথা থাকে। আর সাধারণ মানুষদের অন্তর স্বভাবতই প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নানা রিপু ও বাহ্যিক কামনা-বাসনা দিয়ে ভরপুর। ফলে সূফী শাতহ তাদের বিশুদ্ধকরণের পরিবর্তে উল্টো তাদের অন্তরে প্রবৃত্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে দগ্ধ হয়ে তারা চিৎকার করতে থাকে। এর সবই স্পষ্ট ভ্রান্তি।

কখনো কখনো এই শাতহের মাধ্যমে আল্লাহর মুহাব্বাতের দাবিও করা হয়। অথচ এটা সর্বাঙ্গীনভাবে ক্ষতিকর। একবার একদল কৃষক তাদের চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে এ ধরনের দাবি করে বসেছিল।

❁ হিকমাহ

হিকমাহ হচ্ছে কোনো কিছু জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা। ইবনু কুতাইবা বলেন, কোনো ব্যক্তির মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম এবং আমলের সমন্বয় না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হাকিম (প্রজ্ঞাবান) হতে পারে না। আর এ সময়ে এসে এ শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে চিকিৎসক এবং জ্যোতির্বিদদের ক্ষেত্রে![১]

[১] দর্শনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অনেকে হিকমাহ শব্দটি ফালসাফা তথা দর্শন অর্থে ব্যবহার করেন। দার্শনিককে হাকীম বলেন। অথচ এটা কুরআন-সুন্নাহতে ব্যবহৃত শরয়ী পরিভাষা। দর্শনের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।—সম্পাদক

উলূমে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় ইলম

উলূমে মাহমূদাহর প্রকার

উলূমে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় ইলম দুই প্রকার—

১. এমন ইলম যা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশংসনীয়। এই ইলম যত বেশি অর্জিত হবে ততই উত্তম এবং তা প্রশংসার উপযুক্ত। এই ইলম হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে জানা, তাঁর গুণাবলি, কার্যাবলি এবং দুনিয়ার পর আখিরাত-জগতের অন্তর্নিহিত কারণ সম্বন্ধে জানা। এই ইলমের চাহিদা স্বভাবগতভাবেই জন্মায় এবং এর মাধ্যমে আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের পথ সুগম হয়। এই ইলম হচ্ছে সেই সমুদ্র, যার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। শুধু তার তীরে এবং প্রান্তে এসে লোকেরা নিজ-নিজ সাধ্য অনুযায়ী ঘুরপাক খেতে থাকে।

২. যে ইলম নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী জানা প্রশংসনীয়। আর তা হচ্ছে, যা ফরযে কিফায়াহ হিসেবে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটিরই সীমাবদ্ধতা, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং চূড়ান্ত সীমানা আছে।

এবার আপনি দুই ব্যক্তির যে-কোনো একজন হতে চেষ্টা করুন। হয়তো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, নয়তো নিজের ব্যস্ততা আগে সেরে অন্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। তবে অন্যের উপকার ও কল্যাণ নিয়ে ভাবার আগে নিজের চিন্তাটা করে নিন। নিজের বাহ্যিক খোলসকে পরিশুদ্ধ করার আগে প্রথমে নিজের অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ করুন এবং তাকে লোভ, হিংসা, লৌকিকতা এবং আত্মতৃপ্তির কদর্যতা থেকে পবিত্র করুন। ইনশাআল্লাহ, সামনে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আপনি যদি নিজেকে এ সকল কদর্যতা থেকে বিরত রাখতে না পারেন, তবে ফরযে কিফায়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া আপনার জন্য অনুচিত। কারণ, অনেক মানুষ তা নিয়ে কাজ করছেন। অন্যের ভালো চাইতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যার নিজের পোশাকের ভেতর বিচ্ছু প্রবেশ করেছে, অথচ সে অন্যের শরীর থেকে মাছি তাড়ানোয় ব্যস্ত।

যদি আপনি নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হন তবেই ফরযে কিফায়া নিয়ে ব্যস্ত হোন এবং এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ রাখুন।

প্রথমে পবিত্র কুরআনুল কারীম দিয়ে এ যাত্রা শুরু করুন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ গ্রহণ করুন। অতঃপর কুরআন সংক্রান্ত অন্যান্য ইলম শিখুন। যেমন : তাফসীর, নাসিখ ও মানসুখ, মুহকাম ও মুতাশাবিহ প্রভৃতি বিষয়।

এভাবে সুন্নাহর ক্ষেত্রেও তার আভ্যন্তরীণ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানুন। এ দুটি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর উসূলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা নিয়ে মনোযোগী হোন। এভাবে অন্যান্য ইলম শিক্ষা করুন, যেগুলোর মাধ্যমে জীবন সমৃদ্ধ হয় এবং সময়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়।

তবে শাখাগত কোনো একটা বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করবেন না। কারণ, জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। জীবন সীমিত। তাছাড়া এ সকল শাখাগত জ্ঞান মূলত অন্যান্য মৌলিক ইলমের জন্য সহায়ক এবং তা অর্জনের হাতিয়ারমাত্র। আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবল হাতিয়ার নিয়ে বসে থাকা কাজের কাজ নয়।

বাহাস-বিতর্ক ও মন্দ চরিত্র

বিজয় ও গৌরব লাভের জন্য যে বাহাস-বিতর্কের আয়োজন করা হয় তা বহু নিন্দনীয় গুণাবলির উৎসস্থল। এসব সভা ও আয়োজনের তৎপরতা থেকেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মন্দ স্বভাব তৈরি হয়। সাধারণত কোনো বিতার্কিক অহংকার থেকে নিরাপদ নন। কারণ, তিনি তাঁর তুলনায় ছোটদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে অনেকের উপর নিজেকে উচ্চ মর্যাদাবান মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকেন। অধিকন্তু তিনি লৌকিকতা থেকেও নিরাপদ থাকেন না। আজকাল অধিকাংশ বক্তা এবং তার্কিকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাঁর দক্ষতা জানানো এবং মানুষের মুখে মুখে নিজের প্রশংসা শোনা। বিতর্কের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, সুন্দর ভাষা রপ্ত করা আর দুর্লভ বিষয় মুখস্থ করার মাঝেই তাঁদের জীবন কেটে যায়। এ জীবন পরকালের জন্য ফলপ্রসূ হয় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবেন ওই আলিম, যাঁর ইলম তাঁর কোনো উপকারে আসেনি।'[১]

[১] ইমাম তাবরানী *আল মুজামুস সগীর*-এর মধ্যে (হাদীস-ক্রম : ৭০৫), ইমাম সুয়ূতী *আল-জামিউস সগীর*-এর মধ্যে (হাদীস-ক্রম : ১০৫৩), ইমাম বাইহাকী *শুআবুল ঈমান*-এর মধ্যে (হাদীস-ক্রম : ১৭৭৮) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফিয মুনযিরী রহ. হাদীসটি সম্পর্কে 'যয়ীফ' বলে মন্তব্য করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার রহ. বলেছেন, এর সনদ (রাবী পরম্পরা) ও মতন (হাদীসের শব্দভাষ্য) গারীব। *ফাইযুল কাদীর লিল-মুনাভী* : ১/৫১৮।